পরিক্রমা

দেখে এলাম আলমোড়া

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

॥ ১ ॥

পূর্বাকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। সবেমাত্র খসে পড়েছে রক্তিম রশ্মির খোলস। তাপহীন উত্তাপ। অরণ্যে ভরা পাহাড়। সর্পিল পথ। ঝোপঝাড় বড্ড। খুব উঁচু-নিচু। সঞ্জয়, সুবীর ও শান্তনু—তিন তরুণ হাঁটছে। সঙ্গে দিলীপ ও আমি। স্থানীয় কুমায়ুনী মোহন সিং আমাদের গাইড, অতি সন্তর্পণে পথ দেখিয়ে চলেছে। এবার কোন পথ নেই। একেবারে খাড়াই। কিন্তু অতিক্রম করতে হবে আমাদের। মোহন সিং সতর্ক করে দিল আমাদের—পা ফসকালেই মৃত্যু। সঞ্জয় ও সুবীর বেশ দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে গেল গুহায়। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে শান্তনু ও আমি এসে গেলাম গুহায়, অবশ্য মোহনের সহায়তায়। দিলীপ পিছিয়ে। হঠাৎ শোনা গেল দিলীপের আর্তস্বরঃ "মোহনজী, মুঝকো পাকড়িয়ে। ম্যায় ক্যায়সে জায়ুঙ্গা?" মোহন তৎপরতার সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে দিলীপকে ধরে ফেলল। তারপর দিলীপকে নিয়ে আমাদের কাছে হাজির। হ্যাঁ, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের গুহায় এসে গেছি। সব দূর হয়ে গেল—আমাদের পথশ্রান্তি, পথশ্রম, পথক্লান্তি।

ঠিক সাতানব্বই বছর আগে ১৮৯৮ সালের মে মাসে স্বামীজী দ্বিতীয়বার এসেছিলেন আলমোড়ায়। সঙ্গে গুরুভাই, শিষ্য-শিষ্যারা। কিন্তু স্বামীজীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল নির্জনবাসের। তিনি আলমোড়ার বাড়ি থেকে বনে চলে যেতেন। প্রতিদিন তিনি দশঘণ্টা ঐ বিজন অরণ্যে থাকতেন। একসময়ে যান পাহাড়ের চূড়ায় এক দেবী-মন্দিরে। পাশে ছিল একটি গুহা। দেবীর নাম সিয়া-দেবী। দেবীদর্শন করে গুহায় ধ্যানে বসতেন স্বামীজী। চারদিন (২৫-২৮ মে ১৮৯৮) এখানে ছিলেন তিনি। যখন আবাসস্থলে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর মুখ ছিল দিব্যজ্যোতিতে ভরা। স্বামীজী মনে মনে আনন্দিত হতেন যে, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক জীবনে এখনো তিনি অভ্যস্ত। স্বামীজীর সেই তপস্যাপূত গুহায় আমরাও এসেছি একই মাসে—ভেবে আমাদের মনে শিহরণ জাগল! স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গেয়ে উঠল একজন—'জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি'। স্বামীজীই তো শিব। শিবস্তুতি পাহাড়ে আছড়ে পড়ে দিগ্-দিগন্তে সুরের রেশ ছড়িয়ে পড়ল, আর আমাদের মনেও ছড়িয়ে দিল একরাশ আনন্দের হিল্লোল।

১৮ মে ১৯৯৫। আমরা ভোর পাঁচটায় রওনা হয়েছিলাম সিয়াদেবী দর্শনের জন্য। সিয়াদেবীর মন্দির শীতলাখেত পাহাড়ের ওপর। আলমোড়া থেকে শীতলাখেত উনচল্লিশ কিলোমিটার। মারুতি ভ্যানে সময় নিল পাক্কা দেড়ঘণ্টা। শীতলাখেত থেকে মন্দিরের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটারের চড়াই হাঁটাপথ। মন্দির থেকে গুহা আরও দেড় কিলোমিটার।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে আমাদের একঘণ্টা লাগল। ওঠার সময় আমাদের গাইড মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা। মোহনের বাড়ি মন্দিরের কাছেই। ঠিক যোগাযোগ হয়ে গেল! তারপর থেকে মোহন আমাদের গাইড।

সিয়াদেবীর মন্দির ছোট্ট। পাথরের তৈরি। বেদি একটু উঁচু। সাদা টাইলস দিয়ে বেদিটি তৈরি। দেবীর সঙ্গে গণেশজী ও হনুমানজী রয়েছেন। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে বারো বছর আগে। প্রথমে মন্দির ছিল বর্তমান মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে—গুহার কাছাকাছি। মোহন তার অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাদের জানাল ঃ "আমরা শুনেছিলাম, এখানে কোথাও সিয়া-দেবীর মন্দির ছিল, কিন্তু কোন অস্তিত্ব দেখতে পাইনি। প্রায় বারো বছর আগে দেবী আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বললেন, 'আমি অবহেলায় পড়ে আছি। আমার মন্দির তৈরি করে পূজা কর।' দেবীর মূর্তি কোথায় পড়ে আছে, তাও তিনি জানিয়ে দিলেন। পরের দিন দেবীনির্দিষ্ট স্থানে আমি গেলাম। গিয়ে দেখলাম ভগ্ন ইঁটের স্তূপ। খুঁড়তেই পাওয়া গেল দেবীমূর্তি। আমার অবস্থা তো মোটেই স্বচ্ছল নয়। আলমোড়াতে পরিচিতদের বললাম স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা। উদ্যোগী হলেন গান্ধী আশ্রমের মোতিরাম যোশী। তাঁরই সহায়তায় আমি ও অন্যান্যরা বর্তমান মন্দির তৈরি করে সিয়াদেবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলাম। আমরা শুনেছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ সিয়াদেবীর মন্দিরে এসেছিলেন, গুহায় ধ্যান করেছিলেন। এই ঘটনার স্মরণে আমরা মন্দিরের সামনে একটি স্মারক-ফলক বসিয়েছি।" দেখলাম ফলকে লেখা আছে—"স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থান। বসন্ত পঞ্চমী, সন ১৯৮৯। স্থান সিয়াদেবী মন্দির তপোভূমিমে প্রবাসকে স্মরণ মে স্বামীজীকে স্মারক কা কার্য আরম্ভ।"

ধন্য মোহন সিং, তোমার মতো এক সামান্য সরল ভক্তকে দেবী এক অত্যাশ্চর্য কাজ করিয়ে নিলেন! মোহনকে মনে মনে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানালাম—ঐ জঙ্গলে ভরা নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় স্বামীজীর স্মৃতিকে সে জাগিয়ে রেখেছে। মোহনের আশা—স্বামীজীর নামে এখানে যেন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহনের আশা পূরণ হবে কিনা তা সময়ই বলতে পারে।

॥ ২ ॥

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৫০০ ফুট উঁচু রম্য বনরাজি-পরিবেষ্টিত আলমোড়া। কুমায়ুনের চন্দ্রবংশীয় রাজা কল্যাণ চাঁদ আলমোড়াতে রাজধানী স্থাপন করেন ১৫৬০ সালে। আলমোড়ার পৌরাণিক নাম 'মানসখণ্ড'। কেদার-বদ্রী-কৈলাস-মানসসরোবর দর্শনে যাবার পুরনো পথ আলমোড়া। স্বভাবতই সাধু-সন্ন্যাসীদের ডেরা যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছিল জঙ্গলের মধ্যে। তাঁদেরই কঠোর সাধনা-তপস্যা ও সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন মন্দির—কালামাটিতে কাসারদেবী, চিতইতে আঁটবী-দেবী, উত্তরে নারায়ণকালী, পূর্বে মুণ্ডেশ্বর, বনদেবী, বিষ্ণুদেবাল, দক্ষিণ-পূর্বে কপিলেশ্বর, দক্ষিণ-পশ্চিমে কটারমল প্রভৃতি মন্দির।

আলমোড়ার গভীর অরণ্য-নির্জনতা, ভিক্ষার সুলভতা ও সুজলবায়ুর আকর্ষণে এখানে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক পার্ষদ। উদ্দেশ্য—নিভৃতে সাধন-ভজন-তপস্যা। ভাবতে অবাক লাগে, এগারোজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ আলমোড়ায় এসেছিলেন বিভিন্ন সময়ে—স্বামীজী, শিবানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী, অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী, যোগানন্দজী, প্রেমানন্দজী এবং বিজ্ঞানানন্দজী। প্রথম সাতজন তপস্যা করেছিলেন কাসারদেবীর মন্দিরে, পাতালদেবীর মন্দিরে, অম্বাদত্তের বাগানে ও অন্য নির্জন স্থানে। আলমোড়ায় এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা যোগীন-মা এবং গৃহিশিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ও পলটু (প্রমথনাথ কর), এসেছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী সুরেশ্বরানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যেরাও এখানে এসেছিলেন—মিস হেনরিয়েটা মূলার, গুডউইন, মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন প্রমুখ। স্বামীজীর প্রিয় দক্ষিণী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল ও অধ্যাপক রঙ্গাচার্য বদ্রী-দর্শনের পথে এখানে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন (জুন ১৮৯৭)।

আলমোড়াতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বরিশালের বিখ্যাত জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের। তাঁর পুণ্যস্মৃতি: "আহা, সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ার কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম! কখনো তাঁর বাড়িতে, কখনো আমার বাড়িতে, আর একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে...।"[১]

আলমোড়াতে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ভক্ত লালা বদ্রীশার বাড়িতে স্বামী শুদ্ধানন্দের সন্ন্যাস হয়েছিল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)। সন্ন্যাস দিয়েছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল 'থমসন হাউস' থেকে (আগস্ট ১৮৯৮)। স্বামীজী এখানে দুটি ইংরেজী কবিতা রচনা করেছিলেন—'The Living God' (১৮৯৭) এবং 'Requiescat in Pace' (১৮৯৮)। আলমোড়া থেকে লেখা স্বামীজীর চিঠির সংখ্যা ৩১, শিবানন্দজীর ২৮ এবং তুরীয়ানন্দজীর ৭৫। স্বামীজীর চিঠিগুলিতে তাঁর সে-সময়কার বিভিন্ন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর তুরীয়ানন্দজী বহু জিজ্ঞাসুর অধ্যাত্ম-পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন তাঁর উদ্দীপনাময় পত্রগুলির মাধ্যমে। স্বামীজীকে চারটি হৃদয়বিদারক মৃত্যুসংবাদ সইতে হয়েছিল আলমোড়াতে বসে—প্রিয় বিশ্বস্ত সেবক গুডউইনের ও মাদ্রাজের রাজম আয়ারের অকালমৃত্যু, গাজীপুরের পওহারী বাবার ইচ্ছামৃত্যু এবং আমেরিকায় বেদান্ত-অনুরাগিণী মিসেস জন ব্যাগলীর[২] আকস্মিক মৃত্যু। আলমোড়ায় স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের 'ভারত-পরিচয়' করে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজী তাঁর তিনটি সুললিত ভাষণ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৭৫, পৃঃ ২৬৬

২ আমেরিকার মিশিগানের জন ব্যাগলীর পত্নী, ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বমেলাতে একজন মহিলা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৯৪ সালে স্বামীজী ব্যাগলীদের ডেট্রয়টের বাড়িতে ছিলেন।

আলমোড়াবাসীদের শুনিয়েছিলেন। স্বামীজীর প্রিয় ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন তুরীয়ানন্দজী ও শিবানন্দজী আলমোড়ায় একটি আশ্রম সূচনা করে।[৩] আলমোড়ায় লণ্ডনের ই. টি. স্টার্ডি পরিচিত হয়েছিলেন শিবানন্দজীর সঙ্গে। ফলে খিয়জফিস্ট স্টার্ডি পরিণত হয়েছিলেন বেদান্তী স্টার্ডিতে। সে-পরিচয়ের ফলশ্রুতি স্বামীজীর লণ্ডনে আগমন ও প্রচারকার্য।

স্বামীজী, শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী আলমোড়ার স্তুতিতে ছিলেন মুখর। হিমালয়ের কামেট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচূলী প্রভৃতির তুষারাচ্ছন্ন চূড়াগুলিকে স্বামীজী কখনো দেখেছেন "প্রতিফলিত সূর্যালোকে রজতস্তূপের" মতো, আবার কখনো লক্ষ্য করছেন "সারি সারি দিগন্তবিস্তৃত বরফের চূড়াগুলির ওপর অপরাহ্নের রক্তিমাভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।" স্বামীজীকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছিল আলমোড়ার "নিবিড় বনরাজি" ও "শীতোষ্ণ জলবায়ু"। আলমোড়া "কেদারখণ্ডের অন্তর্গত" এবং "উচ্চভাবোদ্দীপক" বলে শিবানন্দজী প্রায় দুবছরের ওপর এখানে কাটিয়েছেন সাধন-ভজনে। আলমোড়া "হর-পার্বতীর স্থান" বলে তুরীয়ানন্দজীর অনুভব হয়েছিল। স্বামীজীর স্মৃতির জন্য আলমোড়া তাঁর "বড়ই আদরের" ছিল।

নিবেদিতা প্রমুখ স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের কাছে আলমোড়া ছিল তাঁদের জীবনের শিক্ষাস্থল, ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রথম পরিচয়স্থল। আলমোড়া স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের তপস্যাক্ষেত্র। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে আলমোড়ার দান অপরিসীম। স্মৃতি-বিজড়িত আলমোড়া-দর্শনের জন্য মন বারবার হয়েছে উচাটন, প্রাণ হয়েছে আকুলি-বিকুলি।

॥ ৩ ॥

১৫ মে ১৯৯৫। দেরাদুনে বাসে চড়েছি আলমোড়ার উদ্দেশে। সঙ্গে শান্তনু ও সুবীর। দিল্লী থেকে দেরাদুনে এসেছিলাম। একরাত্রি ছিলাম দেরাদুনের কিশানপুর আশ্রমে। বাস ছাড়ল বিকাল চারটেয়। বেশ গরম। বাসের গতি দ্রুত হতেই ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বাসভর্তি লোক। অনেকে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোন উপায় নেই। বাস হরিদ্বার অতিক্রম করে চলল নাজিবাবাদের পথে। বাসের স্পীডের কাঁটা আশিতে। দুপাশে বন। মাঝে মাঝে শুকনো পাহাড়ী নদী। সূর্য অস্তপ্রায়। সন্ধ্যা হয় হয়। সকলেই নিশ্চুপ। মনে হলো যে-যার চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ সমবেত ভয়ার্তস্বর : "হায়, হায়! রুক্ দিজিয়ে, রুক্ দিজিয়ে!" বাসচালক সজোরে ব্রেক কষল। বাস কোনমতে ঘসতে ঘসতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসের ছাদের সঙ্গে ওভারহেড ইলেকট্রিক তারের সংঘর্ষ। বিপদ ঘটেনি। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, এযাত্রা প্রাণে বাঁচা গেল। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! পথে পথে এত সাবধানবাণী—'সাবধানী হটী'। 'দুর্ঘটনা ঘটী'। কিন্তু সেসব কথা বাসচালকদের কখনো চোখে পড়ে না। যাত্রীরা কেবল ইষ্টনাম জপ করে।

বাস চলতে লাগল—যেন কিছুই হয়নি। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। স্নিগ্ধ কিরণে সব যেন ভেসে যাচ্ছে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। শুধু অজানা পোকার একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। স্মৃতির পৃষ্ঠা উন্মীলিত হলো।

আলমোড়াতে সর্বপ্রথম এসেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৮৮ সালের নভেম্বরে। তখনই পরিচয় হয়েছিল লালা বদ্রীশার সঙ্গে। বদ্রীশার পদবী খুলঘোরিয়া। তিনি ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও সাধুসেবা-পরায়ণ।[৪] ঠিক পরের বছর অখণ্ডানন্দজীর পরিচয়পত্র নিয়ে শিবানন্দজী বদ্রীশার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন বদ্রীনাথ থেকে। বদ্রীশার সঙ্গে শিবানন্দজীর সম্পর্ক হলো নিবিড়। বদ্রীশা শিবানন্দজীকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতেন, মান্য করতেন পিতার ন্যায়। শিবানন্দজীর আশীর্বাদেই তিনি পুত্র সিদ্ধদাসকে লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন।[৫] বদ্রীশার বেশ কয়েকটি বাংলোবাড়ি ছিল আলমোড়ায়। পুরনো বাজারের বাড়িটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের আস্তানা। সেই থেকে বদ্রীশা ও তাঁর সমগ্র পরিবার গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে। বদ্রীশা ও তাঁর পাঁচ ভাই জয়রাম, মোহন, গাঙ্গী, গোবিন্দ ও ধনীর[৬] রামকৃষ্ণ-সংঘের সেবা অতুলনীয়। শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী বেশ কিছুকাল আলমোড়ায়[৭]

৩ ১৯১৬ সালে আলমোড়াতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির' নামে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বদ্রীশার আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের বেশ কয়েকটি চিঠিতে এবিষয়ে উল্লেখ আছে।

৫ সিদ্ধদাস জীবিকায় শিক্ষক ছিলেন। এঁর কোন পুত্র ছিল না।

৬ মোহনের কোন পুত্র ছিল না। গোবিন্দ ও গাঙ্গী বিয়ে করেননি। জয়রাম ও ধনীর পুত্র ছিল।

৭ শিবানন্দজীর আলমোড়ায় অবস্থান : ১৮৮৯ সালে কয়েক মাস, ১৮৯৩ সালে কয়েক মাস, ১৮৯৭ সালে, ১৯১৩ সালে দেড়বছর, ১৯১৫ সালে কয়েক মাস। তুরীয়ানন্দজীর অবস্থান : ১৮৯৮ সাল, ১৯১৫-১৯১৬ সাল—প্রায় এক বছরের কাছাকাছি।

বদ্রীশার বাড়ি

অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ—শীতলস্থানে বিশ্রাম। তাই স্বামীজী এসেছিলেন তাঁর প্রিয় আলমোড়ায় বদ্রীশার বাড়িতে (১৮৯৭)। এই নোদিয়াতে বদ্রীশার নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন স্বামীজীকে। তাঁর নামে সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন তাঁরা। বাস চলতে আরম্ভ করল। আমরা পৌঁছে গেলাম 'আকাশবাণী'র মোড়ে। এখানেই আমাদের আশ্রম।

ছবির মতন আশ্রমটি পাহাড়ের কোলে। চীর-পাইন গাছে ঘেরা। জানা-অজানা ফুলের গাছ চারদিকে। শান্তনু 'ফরগেট মি নট' ফুল দেখে বাচ্চা ছেলের মতো হাততালি দিয়ে উঠল। নিচে কোশী নদীর জল প্রায় নেই। এখান থেকে সিয়াদেবীর মন্দির দেখা যায়। আলমোড়া বেলুড় মঠের একটি 'রিট্রিট সেন্টার'। বড়ই উপযুক্ত পরিবেশ। ছোট ছোট কুটির—সারদানন্দ কুটির, ব্রহ্মানন্দ কুটির, সারদা কুটির, তুরীয়ানন্দ কুটির, শিবানন্দ কুটির, প্রেমানন্দ স্মৃতিমন্দির। কোনটাতে লাইব্রেরী, কোনটা অতিথি-ভবন, কোনগুলি সাধুভবন। শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর তৈরি দোতলা বাড়ির দোতলার যে-ঘরে তুরীয়ানন্দজী থাকতেন, বর্তমানে সেটি 'ঠাকুরঘর'।

ছিলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় এখানে স্থাপিত হয়েছিল আশ্রম—'রামকৃষ্ণ কুটির'। মোহন ও গান্ধীর সহায়তা না পেলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা তাঁদের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

স্মৃতির পৃষ্ঠা ধাক্কা খেল—বাস থমকে দাঁড়িয়েছে মোরাদাবাদে। গভীর রাত্রি। নাজিদাবাদ থেকে সোজা পথ ছিল হলদিয়ানী যাবার। কিন্তু রাত বলে বাস হলদিয়ানীতে এসেছে মোরাদাবাদ হয়ে, যদিও ঘুরপথ। এখান থেকে ঘণ্টা তিনেকের আঁকাবাঁকা ঘুরপাক পথ আলমোড়ার। নভেম্বরের শীতের আমেজ পাচ্ছি। ঘুম ঘুম ভাব। ভোর হয়ে এল, পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম—নোদিয়া। আলমোড়া আর বেশি দূর নয়।

স্মৃতির পাতা চকিতে ঝলসে উঠল—পাশ্চাত্যে

॥ ৪ ॥

আশ্রমে পৌঁছে বাসযাত্রায় নড়বড়ে শরীরটাকে আমরা তাজা করে নিলাম। এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে মায়াবতীর কার্তিক, পরে দিল্লীর প্রোজ্জ্বল ও অনক যোগ দিয়েছিল।

আমরা বিকালে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল কবরখানা। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। এই অঞ্চলের স্থানীয় নাম চিল্কাপেটা। কার্তিক দেখিয়ে দিল চিল্কাপেটার নিচে 'আউট হাউস'। আশ্রম হবার আগে শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী এখানে ছিলেন। এটি বদ্রীশার বাংলোবাড়ির 'আউট হাউস'।

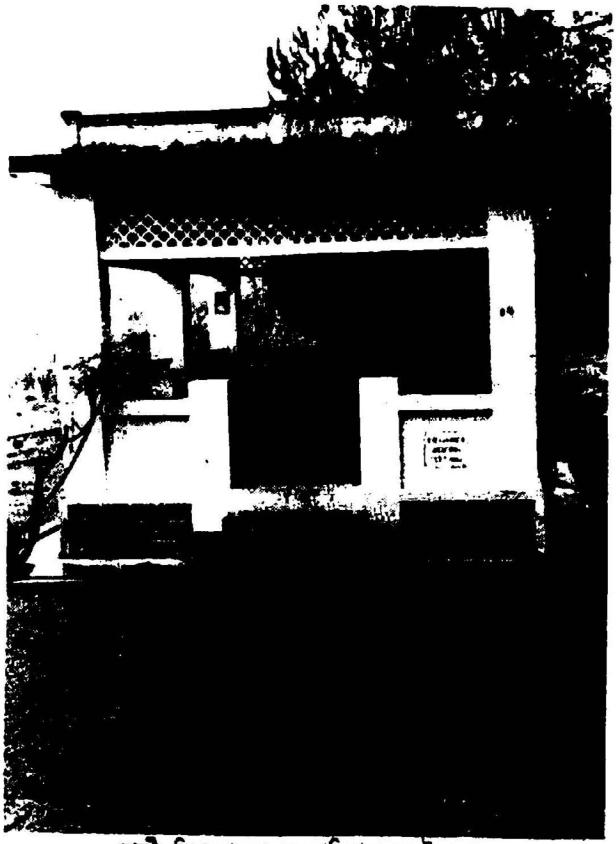

স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রেস্ট হল

বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হোটেল ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং হয় এই বাড়িতে।

আমরা কবরখানায় এসে গেছি। এখানেই ফকির জুলফিকার আলি ক্ষুধায় কাতর পরিব্রাজক স্বামীজীকে শশা খাইয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সঙ্গী ছিলেন অখণ্ডানন্দজী। যেখানে স্বামীজী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে তৈরি হয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রেস্ট হল'—৪ জুলাই ১৯৭১। উদ্যোক্তা আলমোড়ার স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওখানকার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ডঃ বশীশ্বর সেন ও তাঁর পত্নী মিসেস গারচুর্ড সেন।

আমরা বাজারের দিকে হাঁটছি। ফকির জুলফিকারের উদ্দেশে প্রণাম জানালাম মনে মনে। ধন্য তুমি, স্বামীজীর প্রাণ বাঁচিয়েছ! মনে পড়ে গেল, স্বামীজীকে রাজকীয় শোভাযাত্রা করে আলমোড়ার লোকেরা নোদিয়া থেকে শহরের বাজারে বদ্রীশার বাড়িতে এনেছিলেন। শোভাযাত্রার সময় স্বামীজী তাঁর প্রাণরক্ষক জুলফিকারকে দেখতে পেয়েছিলেন। দৌড়ে গিয়ে কিছু টাকা স্বামীজী তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। স্বামীজীকে যখন বাজারে সুসজ্জিত সুদৃশ্য মঞ্চে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছিল, তখন জুলফিকারকে দেখতে পেয়ে স্বামীজী তাঁকে মঞ্চে এনে জনতার সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অভ্যর্থনাসভায় সমিতির পক্ষ থেকে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী[৮], বদ্রীশার পক্ষ থেকে পণ্ডিত হরেরাম পাণ্ডে[৯] এবং অন্য এক পণ্ডিত যথাক্রমে হিন্দি ও সংস্কৃতে স্বামীজীর অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ও আবেগপূর্ণ ভাষায় বৈরাগ্যমণ্ডিত হিমালয়ের অধ্যাত্মমহিমা কীর্তন করেছিলেন।

স্মৃতি-রোমন্থনে ছেদ পড়ল। ঘোর কলরব। সেই একই বাজার—যে-পথ দিয়ে স্বামীজী হেঁটেছিলেন, যেখানে বিপুল জনস্রোত স্বামীজীকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করেছিল—আজ তার কত পরিবর্তন! গিজগিজ করছে দোকানপাট। হাঁটাচলার পর্যন্ত অসুবিধা। পাশেই রঘুনাথ-মন্দির। রঘুনাথজী সে-দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। আজও তিনি এই পরিবর্তনের সাক্ষী!

৮, ৯ পণ্ডিত যোশী ও পণ্ডিত পাণ্ডে উভয়েই ছিলেন উকিল ও শিক্ষানুরাগী, জেলা ইন্টার কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পণ্ডিত যোশী কলকাতার এন্টালীতে থাকতেন, ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল এবং আলমবাজার মঠে নিয়মিত অর্থাদি দিতেন। তাঁর নাতি ডাঃ প্রজাপতি যোশীর কাছে এখনো অখণ্ডানন্দজী, অভেদানন্দজী, নির্মলানন্দজী ও সদানন্দজীর লেখা মূল চিঠি আছে। পণ্ডিত যোশী ছিলেন গোয়ালিয়র মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি (১৯০৫-১৯২৫)। পণ্ডিত পাণ্ডে ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মসাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর নাতি এখনো জীবিত। তিনি এখন আলমোড়ায়।

স্বামীজীর বাসস্থান লালা বদ্রীশার বাড়ির দেওয়ালে মার্বেলের স্মারক-ফলক "স্বামী বিবেকানন্দজী নে লালা বদ্রী শাহকে অতিথিরূপমে ইস ভবনমে ১৮৯০ ঔর ১৮৯৭মে নিবাস কিয়া থা"—পথচারীদের নজর পড়ে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে বাড়িটি শা-পরিবার ভাড়া দিয়েছেন। ওখানে সাইনবোর্ড আছে—"খেম সিং মোহন সিং রৌতেলা।" এই বাড়ির দোতলায় ছিলেন স্বামীজী, অখণ্ডানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী, শিবানন্দজী, যোগানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী এবং বিজ্ঞানানন্দজী। এছাড়াও ছিলেন সদানন্দজী, সচ্চিদানন্দজী, শুদ্ধানন্দজী, ধীরানন্দজী (তখন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল) এবং গুডউইন।[১০]

থমসন হাউস

॥ ৫ ॥

কার্তিক আমাদের 'ওখলে হাউসে' নিয়ে এল। এখানে স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যা-শিষ্যারা ছিলেন (১৮৯৮)— ওলি বুল, ম্যাকলাউড, সেভিয়ার-দম্পতি, মিসেস প্যাটারসন ও নিবেদিতা। এই বাড়িটিও বদ্রীশার। বাড়িটি 'আন্টা হাউস' নামেও পরিচিত। বাড়িটির বর্তমান মালিক বদ্রীশার ভাই ধনীর নাতি গিরিশ। গিরিশের বাবা প্রয়াত জওহরলাল ছিলেন মিলিটারী ক্যাপ্টেন। এরই একটি অংশে গিরিশ সপরিবারে থাকে। অপর অংশে হোটেল। গিরিশ বাড়িটির নামকরণ করেছে 'নিবেদিতা কটেজ'। সার্থক নাম!

এই বাড়িতে স্বামীজী প্রতিদিন প্রাতঃরাশ করতেন তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যা-শিষ্যাদের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, ইতিহাস, কৃষ্টি, শিল্প, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এগুলি 'নোট্' করেছিলেন। 'নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস ওইথ দ্য স্বামী বিবেকানন্দ' এবং 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' পুস্তকে নিবেদিতা তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে নিবেদিতাকে স্বামীজী আশীর্বাদও করেছিলেন।

গিরিশের কাছে তিনটি অমূল্য সম্পদ রয়েছে—স্বামীজীর লেখা তিনটি ইংরেজী মূল চিঠি। দুটি বদ্রীশাকে লেখা—১৮৯৬ সালের ২১ নভেম্বর ও ১৮৯৭ সালের ৭ এপ্রিল। তৃতীয়টি সারদানন্দজী ও কৃপানন্দজীকে (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) লেখা—১৮৯০ সালের ৬ জুলাই। প্রথম ও তৃতীয় চিঠি স্বামীজীর 'Complete Works' এবং 'বাণী ও রচনা'তে প্রকাশিত।[১১] দ্বিতীয় চিঠিটি এখনো অপ্রকাশিত।

১০ পাশেই বদ্রীশার আত্মীয় চিরঞ্জীবশার বাড়িতে স্বামীজী দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বদ্রীশার এক ভাইপোর বাড়িতে স্বামীজী আহার করতেন।

১১ প্রথমটির তারিখ—২১ নভেম্বর ১৮৯৬। (দ্রঃ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩০৬ এবং 'Complete Works', Vol. VI, 1985, p. 383) দ্বিতীয়টির তারিখ—৬ জুলাই ১৮৯০। (দ্রঃ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৩২ এবং 'Complete Works', Vol. VI, 1985, p. 242)

এছাড়া এখানে স্বামীজীর একটি অপূর্ব চিত্র রয়েছে—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গিরিশের মায়ের দাবি—স্বামীজীর ব্যবহৃত আয়না ও টেবিলল্যাম্প তাঁদের জিম্মায়।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যা-শিষ্যাদের জন্য হিমালয়ের কোলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বদ্রীশা 'ওখলে হাউস' স্বামীজীকে দান করতে চেয়েছিলেন। দূরদর্শিনী মিসেস সেভিয়ার তখন বলেছিলেনঃ একশো বছর পর এ-স্থান নির্জন থাকবে না। সেভিয়ারের মনঃপূত নয় বলে স্বামীজী আর সে-দান গ্রহণ করেননি।

আমাদের এবার দর্শনীয় স্থান 'থমসন হাউস'। বদ্রীশার এই বাংলোবাড়িটি সেভিয়াররা নিয়েছিলেন স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য। এবারে স্বামীজীর সঙ্গীরা ছিলেন—তুরীয়ানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী, সদানন্দজী, স্বরূপানন্দজী ও সুরেশ্বরানন্দজী। এই বাড়িতে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে মঠ-মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ লাভ করেছিলেন স্বামীজীর অপূর্ব চিন্তাধারা—রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও উপায়। তিনি জানতে পেরেছিলেন নব্য ভারতের জাতীয় আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা। এখানে স্বামীজী ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলেন প্রিয় গুডউইন, পওহারী বাবা, মিসেস জন ব্যাগলী ও মাদ্রাজের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার তরুণ বিদগ্ধ সম্পাদক রাজম আইয়ারের মর্মন্তুদ মৃত্যুসংবাদে।

স্বামীজী বড়ই বিচলিত হয়েছিলেন রাজম আইয়ারের মৃত্যুর পর 'প্রবুদ্ধ ভারত' বন্ধ হয়ে যাবে বলে। তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সেভিয়ারদের কাছে, যাতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' আবার প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর ইচ্ছা তাঁদের কাছে ছিল আদেশ। তাঁরা অর্থসাহায্য করতে রাজি হলেন। স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দকে নির্বাচিত করলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদকরূপে। সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন 'ডন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। স্বামীজী পত্রিকার মূলমন্ত্র দিলেনঃ "Arise! Awake! And Stop not till the goal is reached." 'প্রবুদ্ধ ভারত' পুনঃপ্রকাশিত হলো 'থমসন হাউস' থেকে ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে। মায়াবতীতে পত্রিকা প্রকাশনার অফিস স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত 'থমসন হাউস' থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হয়েছিল। আজ সেই পত্রিকা শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। 'থমসন হাউস'-এ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের একটি স্মারক-উৎসব করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার করলে 'থমসন হাউস' রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে ঐতিহাসিক বাড়িরূপে চিহ্নিত।

বর্তমানে 'থমসন হাউস' উত্তরপ্রদেশ সরকারের অধীন। ওখানে হয়েছে আই. টি. আই—পণ্ডিত জনার্দন যোশী রাজকীয় উদ্যোগী প্রশিক্ষণকেন্দ্র। বড়রাস্তার একটু ওপরে বাড়িটি।

॥ ৬ ॥

'থমসন হাউস'-এর স্মৃতির রেশ কাটতে না কাটতে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমাদের গাইড—আশ্রমের স্বামী হরিশানন্দ। আশ্রম থেকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হাঁটলেই 'ইংলিশ ক্লাব'। এখানে ইউরোপীয়দের নিকট স্বামীজী ওজস্বিনী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয়ঃ বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। তারিখ—২৮ জুলাই ১৮৯৭। সভাপতি—গোর্খা রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল পুনি। বদ্রীশা, চিরঞ্জীবশা, জ্বালাদত্ত যোশী প্রমুখ স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত হেনরিয়েটা মুলারঃ "তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য বোধ হইল যেন আচার্য, তাঁহার বাণী, শ্রোতৃবৃন্দ ও সকলের মধ্যে অনুস্যূত ভাবরাশি সব এক হইয়া গিয়াছে; যেন 'আমি', 'তুমি', 'উহা', 'ইহা'—এই ভেদবোধ আর নাই। যেসকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সেই কয়েক মুহূর্ত আচার্যবরের দেহনিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপ্রবাহে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন...।" 'ইংলিশ ক্লাব' বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অফিস।

'ইংলিশ ক্লাব' থেকে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো পোস্ট অফিস চোখে পড়ল। ওর ঠিক বিপরীত দিকে পাহাড়ের ওপরে ছিল অম্বাদত্তের বাগানবাড়ি, যা বর্তমানে ঘরবাড়ির জঙ্গল। অম্বাদত্তের পুরো নাম অম্বাদত্ত যোশী। সে-সময়ে এই অঞ্চল ছিল গভীর নির্জন। এখানে স্বামীজী, অখণ্ডানন্দজী, সারদানন্দজী ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

সাধন-ভজন করেছিলেন। এখন বাগানের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

চোখের জল চোখে রেখেই আমরা হাঁটছি। পরবর্তী দর্শনীয় স্থান জেলা হাইস্কুল—বর্তমানে রাজকীয় জেলা ইন্টার কলেজ। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল: "আরে, ঐ তো ইন্টার কলেজ!" স্বামী হরিশানন্দ বললেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওটাই। কথা বলতে বলতে খেয়াল করিনি। চলুন, চলুন। রাস্তা থেকে নিচে নামতে হবে।" পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল—১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। বিরাট স্কুল-প্রাঙ্গণে স্বামীজী সুললিত হিন্দিভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত পাঁচশো শ্রোতার সম্মুখে। তারিখ—২৭ জুলাই ১৮৯৭। আবার ৩১ জুলাই শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনুরোধে স্বামীজী এখানে ইংরেজীতে আরেকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গুডউইন তখন আলমোড়াতে ছিলেন না—তিনি তখন মাদ্রাজে। তাই স্বামীজীর তিনটি বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়নি।

গোড়ার কথা বলতে ভুলে গেছি! যেদিন আমরা সীয়াদেবী দর্শনে গিয়েছিলাম সেইদিনই পাতালদেবী ও কাসারদেবী দর্শন করেছিলাম। আলমোড়া থেকে পাতালদেবী মাত্র ছয় কিলোমিটার। রাস্তা থেকে নিচে। শিবানন্দজী এখানে কয়েক মাস ছিলেন। তখন এস্থান গম্ভীর ও নির্জন ছিল। মন্দিরের পাশেই দুটি ঘর আছে—সাধুদের সাধন-ভজন করার জন্য। শিবানন্দজী এর একটি ঘরে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কাসারদেবী এখান থেকে আরও ছয়-সাত কিলোমিটার দূরে কানামাটিতে। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির। পাশেই

কাঁকড়িঘাট

গুহা। আরও নির্জন। স্বামীজী, সারদানন্দজী প্রমুখ এখানে তপস্যা করেছিলেন। দুটি মন্দিরই ছোট, পাথরের তৈরি। গুহার প্রায় ভগ্নদশা। তবে মন্দির-দুটিতে প্রবেশ করলে গা ছমছম করে।

পরিব্রাজক স্বামীজীর আলমোড়ার প্রথম স্থানটিতে এখনো আমাদের যাওয়া হয়নি। কাঁকড়িঘাট। হলদিয়ানী ও আলমোড়ার মধ্যে। আলমোড়া থেকে বাসে ৪০ মিনিট লাগে। একদিন সকালে আশ্রমের ধীরেনকে নিয়ে আমরা কাঁকড়িঘাটে গেলাম। কোশী নদী। বিশাল প্রাচীন অশ্বত্থগাছ। স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজী নৈনিতাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসেছিলেন। গভীর জঙ্গল। নির্জন পরিবেশ। অশ্বত্থবৃক্ষ। নদীর জল টলটল করছে। দুজনে স্নান করে গাছের তলায় ধ্যানে বসলেন। এখানে স্বামীজীর এক বিশেষ অনুভূতি হয়েছিল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে পরিচালিত। তাঁর এই অনুভূতি তিনি অখণ্ডানন্দজীকে বলেছিলেন। এখন আর জঙ্গল নেই। পাশে শিবমন্দির। আমরা চুপচাপ গাছের তলায় বসে রইলাম। শান্তনু ঠাকুর, মা, স্বামীজীর স্তোত্র ও গান গাইল। গলা মেলালাম। একঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। শিল্পী সুবীর নিপুণতার সঙ্গে অশ্বত্থগাছের স্কেচ আঁকল। ও আরও স্কেচ করেছে বিভিন্ন স্থানের। প্রোজ্জ্বল আমাদের ফটোগ্রাফার। বাস থেকে দক্ষতার সঙ্গে কাঁকড়িঘাটের ফটো তুলেছিল প্রোজ্জ্বল।

॥ ৭ ॥

স্মৃতি-ডায়েরীর পৃষ্ঠা উলটে-পালটে দেখছি—দর্শনীয় কোন কিছু বাকি রইল কিনা! আরে, দেউলধারে তো যাওয়াই হয়নি। দেউলধারে চিরঞ্জীবশার বাংলোবাড়ি ছিল। স্বামীজী এখানে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়েছিলেন (১৮৯৭)। এখান থেকে গুডউইন বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন ওলি বুলকে। আলমোড়া থেকে অনেক দূর। এযাত্রায় সময় নেই আমাদের হাতে। বাড়িটি এখনো আছে, তবে মালিক এক গুজরাটি ভদ্রলোক। স্বামীজীর ব্যবহৃত পালঙ্ক ইত্যাদি রয়েছে সেখানে।

আলমোড়ার 'কুন্দন হাউস' স্বামীজী-শিষ্যা ম্যাকলাউড ও ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ১৯২৬ সালে ম্যাকলাউড এই বাড়িটি ভাড়া করেছিলেন। তখন আলমোড়াতে ছিলেন ম্যাকলাউডের শিল্পিবন্ধু আর্ল ব্রিউস্টার ও তাঁর স্ত্রী। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ডঃ বশীশ্বর সেন ও ক্রিস্টিন অতিথিরূপে ম্যাকলাউডের কাছে ছিলেন। পরে বশীশ্বর সেন 'কুন্দন হাউস'-এ সস্ত্রীক পাকাপাকি বাস করেন। ক্রিস্টিন আরও অনেকবার বশীশ্বর সেনের বাড়িতে এসে থেকেছিলেন। বাড়ির একটু দূরে বশীশ্বর সেন 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরী' তৈরি করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ল্যাবরেটরীটি ভারত সরকারকে দান করে যান—'কুন্দন হাউস'-সহ।

আলমোড়াতে পাঁচদিন ছিলাম। মনে পড়ে, স্বামীজীর আলমোড়ায় অবস্থানের চার মাসের স্মৃতি—কত ঘটনা, স্বামীজীর কত চিন্তাভাবনা। মনে পড়ল স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী অচ্যুতানন্দের (গুপ্তনিধি) শহরে স্বামীজীর গীতাপাঠের কথা। সকলকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শিবানন্দজীর ধর্মপ্রসঙ্গ ও তুরীয়ানন্দজীর বৈঠকী ধর্মালোচনা আলমোড়াবাসীর ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তপস্যার বিরতি দিয়ে তাঁরা এসব করতেন। এসব কি কখনো ভোলা যায়?

আজও আলমোড়া আমাদের ডাকে। সিয়াদেবীর পাহাড়ের চূড়া আমাদের হাতছানি দেয়। পাতালদেবী, কাসারদেবী আমাদের টেনে আনে। বিরাট বিরাট পাইনগাছের ঝিরঝির শব্দে ভেসে আসে স্বামীজীদের স্মৃতি। ডালিমগাছের রক্তিম ফুল নিবেদিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'থমসন হাউস'-এর গোল থাম 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কথা বলে। জেলাস্কুলের প্রাঙ্গণ স্বামীজীকে ডাকে বক্তৃতার জন্য। 'ওখলে হাউস'-এর বারান্দায় ম্যাকলাউডরা প্রতিদিন সকালে আসেন স্বামীজীর কথা শুনতে। বাজারে বদ্রীশার বাড়ি কেঁদে ওঠে, স্বামীজী আবার কবে আসবেন? অম্বাদত্তের বাগান হায়হায় করে—আর কোনদিনই স্বামীজীরা এখানে আসবেন না!

একশো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—স্বামীজীর আলমোড়ায় শুভাগমনের। হায়! এখনো কোথাও স্মৃতিফলক বসল না, কেউ বসাল না! আর কবে হবে?□